আলো অন্ধকারের অনু‘ঘটক’

ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় দেশভাগ ও নারী জীবন

কাবেরী মল্লিক (স্নাতক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপণ বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

সারসংক্ষেপ

দেশভাগের দুঃখ ও নারী, এই দুইয়ের রাগে বেজে উঠত ঋত্বিকের ছবির সূর। ঋত্বিক মানতেন দেশভাগ আর সমসাময়িক নারীদের দুঃখ সিনেমার পর্দায় ফুটিয়ে তোলা বেশ চ্যালঞ্জিং। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন লঘু ট্র্যাজেডি নয়, ছবি হবে নারী প্রধান ও দেশভাগের দুঃখকাতর জনজীবন নিয়ে! ঘটকের সিনেমার অধিকাংশ নারী চরিত্র জীবনের সমস্ত উত্থান পতন পেরিয়েও যেন জীবনযুদ্ধে হেরে যায় স্বাধীনতা প্রাপ্য দেশের মতোই।ঋত্বিক কখনোই দেশভাগের যন্ত্রণা ভুলে বাঁচতে পারেননি। তিনি শুধুমাত্র এই দর্শনের সাথে বসবাস করছিলেন এমনই নয় বরং এটি তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নত করেছিল যে সেই ধারণার উপর ভিত্তি করেই তিনি তার অধিকাংশ সিনেমার থিম হিসেবে শিকড় উপড়ে আসা ছিন্নমূল মানুষদের বেছে নিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক বিষয়
ঋত্বিক ঘটক, চলচ্চিত্র, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু নারী জীবন।

সিনেমা শব্দটির ব্যুৎপত্তি মূলত ফ্রেঞ্চ শব্দ ‘সিনেমাটোগ্রাফ’ থেকে যা আবার গ্রীক শব্দ ‘Kinema’ থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘movement’। তাই সিনেমা আসলেই এমন একটি শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ চলন্ত ছবি। সিনেমা এমন একটি বিশ্বব্যাপী বিনোদন মাধ্যম যা বিনোদনের ক্ষেত্রে কোনদিন কোনরকম নিয়মের তোয়াক্কা না করেই নিজের স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। সিনেমা দর্শকদের জীবনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত এমন অনেক জিনিস অনুভব করার সুযোগ করে দেয় যা হয়তো পর্দার সামনে বসা দর্শকের কোনোদিনই অর্জন করার ক্ষমতা নেয়। কিন্তু সিনেমার কাহিনী মাত্র। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দর্শককে মানসিক ভাবে সেই আনন্দ বা বিনোদন লাভের সুযোগ করে দেয়। বিনোদন শিল্প বৈচিত্র্যময়। প্রত্যেক স্বতন্ত্র দর্শকের জন্যে কোনো না কোনো বিনোদন মাধ্যম রয়েছে। চলচ্চিত্র হল বিনোদনের সেরা ফর্মগুলির মধ্যে একটি কারণ চলচ্চিত্র জগতের বিস্তার অপরিসীম। এখানে ব্যক্তিগত পছন্দ সাপেক্ষে প্রত্যেক দর্শকের জন্য রয়েছে অজস্র সিনেমার বিকল্প ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি সিনেমার তার নিজস্ব চিত্রনাট্য, কাহিনী, সিনেমাটোগ্রাফি, আবহ সঙ্গীত নিয়ে গল্প বলার জন্য প্রস্তুত।

ভারতের চলচ্চিত্র যাত্রার পথপ্রদর্শক হীরালাল সেন। প্যারিসের ‘পাথে ফ্রেরেস স্টুডিও’র সদস্য ও অধ্যপক স্টিভেনসনের একটি নাতিদীর্ঘ ছবি ‘The Flower of Persia’ (পারস্যের ফুল) নামে একটি অপেরার সঙ্গে যৌথ ভাবে দেখানো হয় কলকাতার স্টার থিয়েটারে। এরপরেই স্টিভেনসনের ক্যামেরা ধার করে ওই অপেরার একটি নাচের দৃশ্য নিয়ে হীরালাল বানান তার তথা ভারতবর্ষের প্রথম ছবিঃ A Dancing Scene From the Opera, The Flower of Persia। এরপর ১৯০১ আর ১৯০৪ সালের মধ্যে ক্লাসিক থিয়েটারের পক্ষ থেকে তিনি ভ্রমর, হরিরাজ, বুদ্ধদেব-সহ আরও অনেকগুলি ছবি নির্মাণ করেন। তার সৃষ্ট ছবির মধ্যে পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি হল আলিবাবা ও চল্লিশ চোর। হীরালালের তৈরি তথ্যছবি “ Anti-Partition Demonstration and Swadeshi movement at the Town Hall, Calcutta on 22nd September 1905” কে ভারতের প্রথম রাজনীতিক চলচ্চিত্র রূপে গণ্য করা হয়। যদিও হিরালালের মৃত্যুর আগেই তাঁর সমস্ত কাজ একটি অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায়। পরবর্তীকালে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ধুন্ডীরাজ গোবিন্দ ফালকে ওরফে দাদাসাহেব ফালকে ভারতের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ১৯১৩ সালে দাদাসাহেব ফালকে নির্মিত রাজা হরিশচন্দ্র চলচ্চিত্রটি ভারতের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য নির্বাক চলচ্চিত্র হিসাবে মুক্তি লাভ করে। দাদাসাহেব ফালকে-কে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক বা ‘Father of Indian Cinema’ নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর জীবনকালে তিনি প্রায় চব্বিশ বছর ধরে ৯৫টি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ও ২৬টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ করে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের পথ প্রশস্ত করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিনেমাগুলি হল - মোহিণী ভস্মাসুর (১৯১৩), সত্যবান সাবিত্রী (১৯১৪), লঙ্কা দহন (১৯১৭), শ্রী কৃষ্ণ জন্ম (১৯১৮), কালীয় মর্দন (১৯১৯), সেতু বন্ধন (১৯২৩) ইত্যাদি। এরপরে এল সেই ঐতিহাসিক দিন। ১৯৩১ সালের ১৪ই মার্চ তৎকালীন বোম্বে শহরে ম্যাজেস্টিক সিনেমাতে মুক্তি পেল ভারতের প্রথম ‘টকি ফিল্ম’ বা ‘সবাক চলচ্চিত্র’ আরদেশি ইরানি পরিচালিত ‘আলম আরা’। ‘আলম আরা’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ পৃথিবীর আলো। ‘আলম আরা’ যেন সত্যি ভারতীয় সিনেজগতে এক নতুন আলোর দিশা দেখায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নির্মিত অধিকাংশ চলচ্চিত্রের কাহিনী বা চিত্রনাট্য বেশিরভাগই দেশের প্রতি আদিম গর্ব এবং সম্মানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই প্রতিটি সিনেমা সেসময় দর্শকদের জাতীয়তাবাদকে একটি প্রয়োজনীয়তা হিসাবে অঘোষিতভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সমগ্র দেশ ঔপনিবেশিকতার বন্ধন থেকে সদ্য মুক্ত হওয়ার জেরে স্বাধীনতা পরবর্তী সমস্ত শিল্পতে ছাপ পড়েছিল জাতীয়তাবাদের। সিনেমা-সহ প্রায় সমস্ত বিনোদন মাধ্যমই যেন এই অন্তহীন লুপে আটকে পড়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ৫০-৬০ এর দশকে শুরু হওয়া Indian Film

Renaissance বা ভারতে সমান্তরাল ফিল্ম মুভমেন্ট ভারতীয় চলচ্চিত্রের গতিবিধি চিরকালের মত বদলে দেয়। ভারতীয় চিত্রনাট্যকে জাতীয়তাবাদ এবং ধার্মিক কাহিনী থেকে মুক্ত করে বাস্তব জীবনকেই সিনেমার গল্প হিসাবে বেছে নেওয়ার ঔদ্ধত্য দেখান সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের মত পরিচালকেরা। সমান্তরাল সিনেমার হাত ধরেই যেন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে ভারতীয় চলচ্চিত্র। প্রায়শই পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'-কেই বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের রেনেসাঁর সর্বপ্রথম সিনেমা রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যদিও ঋত্বিক ঘটক 'নাগরিক'-এর শুটিং শেষ করেছিলেন ১৯৫২ সালে কিন্তু ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই সিনেমা অর্থনৈতিক কারণে মুক্তি পায়নি। এছাড়াও, মৃণাল সেন, বিমল রায়, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, শ্যাম বেনেগাল, নন্দিতা দাস প্রমুখ গুণী পরিচালকদের হাত ধরে ভারতীয় সিনেমা বারবার প্রশংসিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মঞ্চে। ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও তার যন্ত্রণা - আমাদের দেশের শিল্পক্ষেত্রের অন্যতম সেরা এবং শক্তিশালী বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে। সিনেমা বারবার পার্টিশনকে গল্পের মূল চরিত্র রূপে ব্যবহার করেছে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দেশভাগের পূর্বে, দেশভাগের সময় এবং পরবর্তিকালে ভারতে যেভাবে হিংস্রতা ছড়িয়ে পড়েছিল তা কল্পনাতীত। এই দেশভাগের জেরে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। সীমান্তের দু'পাশের এই জাতিগত নির্মূল অভিযানে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় ১০ লাখ মানুষ, ধর্ষিত হয়েছিলেন কমপক্ষে ৫০ হাজার মহিলা। এই পার্টিশনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় সিনেমা তৈরি হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০), কোমল গান্ধার (১৯৬১) ও সুবর্নরেখা (১৯৬২)। এছাড়াও ছিন্নমূল (পরিচালক: নিমাই ঘোষ, ১৯৫০), Garam Hawa (পরিচালক: এমএস সাথ্যু ১৯৭৩), Train to Pakistan (পরিচালক : পামেলা রুকস), 1947 Earth (পরিচালক: দীপা মেহতা, ১৯৯৯), Lagaan (পরিচালক: আশুতোষ গোয়ারিকর, ২০০১), Midnight Children (পরিচালক: দীপা মেহতা, ২০১২) ইত্যাদি সিনেমাগুলি দেশভাগ, উদ্বাস্তুদের যন্ত্রণা ইত্যাদি দর্শকদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছে। বাংলা চলচ্চিত্রের নামকরা ইতিহাসের সূচনা মোটামুটি ১৯০০ তখনও বাংলা সিনেমা হয়তো বায়স্কোপে চোখ লাগিয়ে খুঁজছে তার ভবিষ্যৎ ভবিতব্য। তখনও সে জানেনা আর মাত্র অর্ধ শতাব্দীর অপেক্ষা। চলচ্চিত্র জগতের এক অনন্য পরিচালক অন্ধকার ফিলিমে আলোর কপচিয়ে চলে যাবেন। হ্যাঁ লেখক নাট্যকার অভিনেতা এবং প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। " আমাদের ভুক্তভোগী মানুষের নিদারুণ যন্ত্রণা ও ক্লেশকে তুলে ধরতেই চলচ্চিত্রে" আগমন ঋত্বিক ঘটকের। ঋত্বিক শব্দের আক্ষরিক অর্থ যজ্ঞের পুরোহিত । সত্যই তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের পুরোহিত ছিলেন। তিনি আলাদাভাবে কেবল চলচ্চিত্র

নয়, সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছিল মানুষ ঐ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কিছু দিতে। সমাজকে বারবার দেখাতে চেয়েছেন কিছু দৃশ্যপট। দেশ- দেশভাগ- যন্ত্রণা-নারী। খুব সুক্ষ্মরেখায় বাঁধতে চেয়েছিলেন এই পদ্যকে। মধ্যবিত্ত জীবনে ছায়া দিয়ে চলা একটা ধৃষ্টতা। নীতা- সীতা- অনুসূয়া সকলেই শেষমেশ বিজয়ী। আম নাগরিক তারা, উচ্চাশা নেই, আশা নেই, বাঁচতে চেয়েছিল কেবল। যন্ত্রণা এসে বারবার হাতছানি দিয়েছে প্রতিটি নেগেটিভের। উল্টো দিকে এক্সপোজারে ফেলে সাদা-কালো এই জীবনকেই চরিত্র করে তুলেছেন তার জগতের।

“ বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ.../ এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি” – উদ্বাস্তু কবি সুনীল গাঙ্গুলির ‘যদি নির্বাসন দাও’- এর এই লাইনে যেন ফুটে উঠেছে ‘৪৭-এর দেশভাগে ভিটে-মাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে ভেসে যাওয়া প্রতিটি মানুষের নিজের দেশের প্রতিটি এক অলিখিত অধিকারবোধের ছবি। ১৯৪৭-এর দেশভাগ যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল সেই স্মৃতি আজও দগদগে। মাত্র এক রাতের নোটিশে নিজের ‘দ্যাশ’ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন শয়ে শয়ে নিরপরাধ মানুষ। ভারতীয় সিনেমার মূল ধারার বাণিজ্যিক ছবি থেকে আর্ট ফিল্ম বারংবার সিনেমার মূল উপজীব্য বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে ১৯৪৭- এর দেশভাগের যন্ত্রণা। সে ঋত্বিক ঘটকের প্রায় প্রতিটি ফিল্মের গল্পের মূল কান্ডারী - দেশভাগের দরুণ মর্মান্তিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া রিফিউজিদের গল্প। আমার এই গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য ‘৬০-এর দশকে ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ও ‘সুবর্ণরেখা’ চলচ্চিত্র দুটিতে কিভাবে দেশভাগের যন্ত্রণা পরিলক্ষিত হয়েছে তা তুলে ধরা। ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ও ‘সুবর্নরেখা’-তে ৪৭-এর দেশভাগের জেরে উদ্বাস্তুদের নিজেদের দেশ ছেড়ে আসার মানসিক যন্ত্রণার একটি তুলনামূলক আলোচনা। দুটি সিনেমারই কেন্দ্রীয় চরিত্রে নারী বিরাজমান। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ও ‘সুবর্নরেখা’-র কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রের সংগ্রামের বিশ্লেষণ আদৌ কি সিনেমাকে ভালোবেসে সিনেমা তৈরির কাজে নেমেছিলেন? আসলে মনের ভেতরের সমস্ত ব্যথা-যন্ত্রণা অগণিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার খিদে থেকেই সিনেমাকে মাধ্যম স্বরূপ বেছে নিয়েছিলেন ঋত্বিক। সবসময় বলতেন, “ কালকে বা দশ বছর পর যদি সিনেমার থেকে ভাল কোনও মাধ্যম বেরোয়, সিনেমাকে লাথি মেরে সেখানে চলে যাব।” তাই বোধহয় থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে সিনেমার দুনিয়ায় প্রবেশ করলেন ভবা। ‘আরে শালা ও ব্যাকারণ তৈরি করেছে। ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে এমনটাই উক্তি করেছিলেন লেখক নবারুণ ভট্টাচার্য। নিজেকে সবসময় ‘ভাঙ্গা বুদ্ধিজীবী’ বলতেন অর্থাৎ ‘broken intellectual’। এপার বাংলার বোদ্ধা ঋত্বিক কিন্তু আজীবন বাঁচতে চেয়েছিলেন ওপারের ঢাকাই ভবা

হয়েই। " দক্ষিণ কলকাতার প্যারাডাইস ক্যাফে, সেখানে মৃণাল সেন, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়দের সঙ্গে আড্ডায় বসতেন ঋত্বিক ঘটক। ঘনঘন চা আর বিড়িতে টান দিতে দিতে ভবা সিদ্ধান্ত নিলেন ছবি বানাবেন। অকাট্য যুক্তি একটাই, থিয়েটারের থেকে বেশি মানুষের মনের কাছে পৌঁছানো যায় ছবির মাধ্যমে। পৌঁছে দেওয়া যায়, না-বলতে পারা কথা।" (MAHAPATRA, 2020) ঠিক যেমন দেশভাগের যন্ত্রণা সকলকে বলতে চেয়েও যেন তাঁর বলা শেষ হয়না। " কাঁটাতারে রক্তাক্ত তাঁর বুক। হাঁটতে হাঁটতে লালবাগ, খোশবাগ ছাড়িয়ে দূরে দূরে কোথায় যে চলে যেতেন। মর্যদাহে কেবলই বলে, 'বাংলারে কাটিবারে পারিছ, কিন্তু দিলটারে কাটিবারে পার নাই!" ৪৭ এর দেশভাগের কাঁটা তার আজীবন বুকের মধ্যে বয়ে বেড়িয়েছেন ঋত্বিক। আর এই কাঁটাতারের ক্ষরণ থেকেই একে একে সৃষ্টি হয়েছে 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্নলতা', 'কোমল গান্ধার'- এর মত এক একটি কালজয়ী সিনেমা। " ঋত্বিকদা, দুই বাংলার ভাগ নিয়ে আপনার সব ছবিতেই বড্ড মাতামাতি!" " মাতামাতি! বাংলাকে ভেঙে চুরমার করে দিল, আর মাতামাতি! বিক্ষুব্ধ সময়ে মুজরো করব? এটা বদমাইসি! আমি ওই শুয়োরের বাচ্চা...! চাই, খুব বেশি করে চাই দু' বাংলার সংস্কৃতিকে এক ফ্রেমে আঁটতে। তাতে তোমরা মাকর্সবাদীই বলো আর যাই বলো। প্রতিবাদ করাটা দরকার। কিন্তু শালা বুঝল না কেউ।" (MUKHOPADHYAY, 2016) শেষপর্যন্ত ১৯৫৮ সালে ঋত্বিকের প্রথম সিনেমা হিসেবে মুক্তি পায় 'অযান্ত্রিক'। ছবি দেখে বিখ্যাত সমালোচক জর্জেস সাডৌল বলেছিলেন, আমি জানি না অযান্ত্রিক মানে কী? পুরো গল্পটাও বলতে পারবো না কারণ সাবটাইটেল ছিল না। কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখলাম।" (MAHAPATRA, 2020) দর্শক পর্দায় দেখল যন্ত্র অযন্ত্রের প্রেম। আর এক বাঙালের ধক! বিমলের মতোই সময়ের ধার ধারেননি ঋত্বিক, তাই যুগের সাথে বেখাপ্পা এক হৃদয়হীন যন্ত্রে জীবন ঢেলে দিয়ে বাস্তুহারা দুইজনই পেয়েছিলেন আশ্রয় " The parallel between Ghatak and Bimal, then lies not in their relationship to the machine age but rather to a sense of being isolated by a personal vision that goes against the grain. Further, both refugees of Partition, their sense of being out of place is magnified as individuals whose vision of the world differs strongly to many of those surrounding them." (CARRIGY, 2003)

তাঁর প্রতিটি ছবিতেই বারবার ধরা পড়েছে উদ্বাস্তু মানুষদের আর্তনাদ। আসলে তাঁর নিজের প্রতিটি কর্মের মধ্যে দিয়েই তিনি নিজের দেশ ছেড়ে আসার যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করতে চাইতেন। " শেষ হল 'মেঘে ঢাকা তারা'র কাজ। ছবি সেন্সর হচ্ছে। বোর্ডের সদস্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি দেখে বেরিয়ে ঋত্বিককে বললেন, " মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা ছাড়া কী আর ছবি হয় না?" " একবগ্গা ঋত্বিক। তাঁর উত্তর, " আপনার কাছে যা বাস্তব,

তা হয়তো আমার কাছে নয়।" নিজের জীবনের সমস্ত বাস্তব ওরফে দুঃখকে ফুটিয়ে তুললেন ভৃগু আর অনাসুয়ার (MUKHOPADHYAY, 2016) ফ্রেমে। 'কোমল গান্ধার'-এর গল্প মূলত দেশভাগ এবং IPTA-র বিভাজনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই সমস্ত দ্বন্দগুলি যেন অনুসুয়ার মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন ঘটক। একজন অন্য পথে হাঁটা পথিককে আমাদের কারোরই মেনে নেওয়ার ধক ছিল না। সত্যিই খামখেয়ালী, অসভ্য, অপমানজনক, একজন মদ্যপের চলচ্চিত্র যে সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং তা আমরা খোলা চোখে অথবা রাজনৈতিক ঘষা কাঁচের মধ্যে থেকে দেখতে পায়নি। আমরা কখনই নিজেরা বুঝতেও চায়নি, ভারতীয় সিনেমার মধ্যে ঘটকের মর্যাদার এই ইস্যুতে আমাদের নিজেদের প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র এই সিনেমা এবং এর ইতিহাসের আলোচনার মধ্যেই আটকে থেকে গেছিল চিরটাকাল।

শেষ পর্যন্ত কোমল গান্ধার হল থেকে প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। এই ছবির সহ-প্রযোজক হওয়ায় ছবির আর্থিক ক্ষতির বোঝাও তাকে অর্ধেক ভাগ করে নিতে হয়েছে। এই ঘটনা চূড়ান্ত ভাবে ঋত্বিক ঘটকের মনোবল ভেঙ্গে দেয়। এর পরেই তিনি ডুবে যেতে শুরু করেন চূড়ান্ত মদের নেশায়। দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে তৈরি ত্রয়ীর শেষ ছবি 'সুবর্নরেখা'। " সুবর্ণরেখা' সমাজবাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। ইতিহাসের নেমিচক্রে, রাজনীতির দাবার ঘুঁটি হয়ে যেন নির্লিপ্ত মানুষ চলে আসতে বাধ্য হলো সাতপুরুষের ভিটে, কালানুক্রমিক জীবিকা, আর পরিচিত দেশ-কাল ছেড়ে। তারপর নতুন করে ঘর বাঁধার লড়াই শুরু করল, তাদের কয়েকজনকে কেন্দ্র করে পরিচালক একালের জীবন ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ করেছেন, ঘটনা ও চরিত্র উভয় দিক থেকে। ফুটে উঠেছে বর্তমান পরিবেশ ও তদন্তর্গত জীবনসংগ্রাম, বাঁচার দুরন্ত প্রচেষ্টা। এ চেষ্টা কোথাও দল বেঁধে, কোথাও দলছুট একাকিত্বে, কোথাও পারিবারিক ঐক্যের মধ্যে, কোথাওবা সেই ঐক্যের অনিবার্য ভাঙনে।" (SANYAL, 2021) ঋত্বিক ঘটক ভীষণ ভাবে কার্ল জং- এর তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ঋত্বিকের কাজগুলি কার্ল জং-এর 'সম্মিলিত অচেতন' (collective unconsciousness) তত্ত্বকে বারবার প্রমাণিত করে। " To our generation where forced mass migrations, and authority approved in fact, authoritatively-forced ethnic cleansing is on the rise along with an ever-accelerating societal inequality, Ritwik Ghatak has long left for us his art, like Subarnarekha, to reflect not only on the world but also on our own selves. Or as he had written, " The first casualty of that is our sensitivity. It has been gradually benumbed; and I wanted to strike at that." (APURVA, 2021)

প্রতিটি ছবিতে নিজের এক অনন্য ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন

ঋত্বিক, যা তাঁকে তাঁর সমসাময়িক পরিচালকদের থেকে অনন্য করে তোলে। ঘটকের বর্ণনাশৈলী ছিল সত্যজিৎ-এর ঠিক বিপরীত। ঋত্বিকের ছবি দর্শকদের অস্বস্তিকর করে তোলে। তাঁর শেষ চলচ্চিত্র ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ জন্ম দিয়েছিল তাঁর ট্রেডমার্ক বিদ্রোহের। এখানে পরিচালক নিজেই একজন মদ্যপ, মোহগ্রস্ত বুদ্ধিজীবীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যাঁর পরিচয় হয় বাংলায় নকশালদের প্রথম ব্যান্ডের সাথে। যদিও তিনি এটিকে মাত্র একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে তৈরি সিনেমা বলতে অস্বীকার করেছিলেন। “ একান্ত নিজস্ব এক সিনেমার ভাষা ছিল ঋত্বিকের। ঋত্বিকের ছবি দেখলে মনে হয়, হলিউড বলে যেন কখনও কিছু ছিল না! নাটকীয় সংলাপ, চরিত্রদের মঞ্চ-নাটকীয় শরীরী ভাষা, উচ্চকিত অভিনয়, আপতিক ঘটনার অতিব্যবহার, এসব বৈশিষ্ট্য ওঁর ওপর গণনাট্যের দিনগুলির প্রভাব ছাড়াও যা তুলে ধরে, তা হচ্ছে, পশ্চিমী সিনেমার প্রভাব বলয় থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছিলেন ঋত্বিক।” (MUKHOPADHYAY, 2016)

তাই হয়তো একসময় ঋত্বিক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় বলেন, “ কিন্তু ঋত্বিক এক রহস্যময় কারণে সে প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, তাঁর মধ্যে হলিউডের কোনও ছাপ নেই। ...ঋত্বিক মনে-প্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল, আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি। আমার কাছে সেইটেই তাঁর বড়ো পরিচয় এবং সেইটেই তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান এবং লক্ষণীয় বৈশিষ্ট।” শ্রমসাধ্যভাবে বাস্তবসম্মত স্থান-কাল গড়ে তোলার চেষ্টা করার পরিবর্তে ঋত্বিক ঘটক সবসময় গান, মেলোড্রামা এবং কাকতালীয়তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন স্তর থেকে একটি গল্প দেখানোর চেষ্টা করতেন। ক্যালাইডোস্কোপিক, স্বস্তিদায়ক, বিতর্কমূলক, ঘটকের চিন্তা দক্ষতা তার ছবির বিভিন্ন চরিত্র এবং তাদের জীবনের গতিপথের বিভিন্ন দিকের গভীর উত্তেজনাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। “ আদপে ঋত্বিক ঘটক অথৈ সমুদ্র। যে সমুদ্রের ঢেউয়ের কোনও বিরাম নেই, অশেষ জলরাশি। পর্যালোচকরা বলেন ঋত্বিক তাঁর ছবিগুলিতে শেষ দৃশ্যে প্রথম দৃশ্য ফিরিয়ে এনে বৃত্ত সম্পূর্ণ করতেন। কিন্তু সত্যিই কী পরিহাস! নিজের জীবনেরই বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে পারেননি এই শিল্পী। অসম্পূর্ণ থেকে গেছিল “ কত অজানারে” , “ বগলার বঙ্গদর্শন” , “ রঙের গোলাপ” না জানি আরও কত কী! কেউ কেউ বলেন সময়োপযোগী ছবি বানাননি ঋত্বিক, সময়ের থেকে প্রায় ১০ বছর এগিয়ে ছিলেন। ...ঋত্বিক যেন অর্ধেক জলের গ্লাস। তাঁর ভরাট এবং শূন্যতা দুই জায়গাই এখন গবেষণার বিষয়। বেড়াজাল না-মানা, কাঁটাতার না-মানা ঋত্বিক এক অন্তহীন সময়।” (MAHAPATRA, 2020)

এই অন্তহীন সময়ের যেন এক অগ্র পথিক মেঘে ঢাকা আকাশের সন্ধ্যাতারা। সকালের অপেক্ষা সে করে না, রাতের আকাশের মেঘকে দাপটের সাথে স্পষ্ট করে তার বৃষ্টিবিলাসী দর্শককে বলে, এই দেখ মেঘের কালচেপনা! উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে নির্মিত ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' যেন দেশভাগের পরবর্তী জীবন যন্ত্রণার আখ্যান। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারত বিভক্তির প্রেক্ষিতে নিজেদের মাটি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া মানুষদের হয়েই যেন কথা বলে 'মেঘে ঢাকা তারা'। 'মেঘে ঢাকা তারা' ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একাধিক কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র। প্রথমত, এটি দেশভাগের পরবর্তী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উত্থান পতনকে তুলে ধরে। ভারত বিভাজন সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিভাজনের মধ্যে একটি। 'মেঘে ঢাকা তারা'-র গল্প আবর্তিত হয় কলকাতায় গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনির এক ছিন্নমূল পরিবারের জীবনকে ঘিরে। দেশভাগের সময় ওপার বাংলা থেকে উৎখাত হওয়া পরিবারটিকে দেশভাগ নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রায় প্রান্তে ঠেলে দেয়। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সম্পূর্ন চলচ্চিত্রের আখ্যানটি ঋত্বিক ঘটক ফুটিয়ে তুলেছেন ওই পরিবারের জ্যেষ্ঠ কন্যা এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী নীতার মাধ্যমে। চলচ্চিত্রটির প্রথম দৃশ্যে নীতাকে বাইরে কাজ করার পরে অত্যন্ত রোদে হেঁটে বাড়ি ফিরতে দেখা যায়। এই রূপক মাধ্যমেই, গুরুতর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে পরিবারকে যেকোনো ভাবে বাঁচিয়ে রাখার কাজে নীতার অদম্য চেষ্টাকেই যেন তুলে ধরা হয়েছে। নীতা বাড়ি ফিরতেই দেখা যায়, নীতার কাছে নানান আবদার নিয়ে ফরমায়েশ করতে শুরু করে তার দাদা, ভাই, বোন প্রত্যেকেই। সেই আবদারের তালিকা থেকে বাদ পড়ে না নীতার মা-ও। টিউশনির টাকায় প্রত্যেকের দাবি- দাওয়া মেটাতে মেটাতে নিঃস্ব হয়ে পড়ে নীতা। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনোদিনই কারোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই তার। নীতার বড় দাদা সনৎ গানপাগল মানুষ। বাড়ীর অর্থনৈতিক দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার বদলে সে দায়িত্ব চাপিয়ে তার বোন নীতার ওপর। নীতার ছোট ভাইও অর্থনৈতিক ভাবে নীতার মুখাপেক্ষী। নীতার ছোট বোন গীতা মধ্যবিত্তের গণ্ডিতে থেকেও উচ্চবিত্তের আকাঙ্খা দেখে আর সেই শখ পূরণের দাবিদাওয়া চাপিয়ে দেয় নীতার ওপরেই। এরপরেই আমরা দেখি, নীতার বাবার এককালীন ছাত্র ও নীতার প্রেমিক সনৎকে। নীতাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে সে বারবার নিজের রিসার্চ ছেড়ে কোনো কর্মসংস্থান করার চেষ্টা করলেও তাকে বারবার প্রতিহত করে নীতা। নীতা স্বপ্ন দেখে সনৎ একদিন তার মুখ উজ্জ্বল করবে। তার এই সাফল্যের পথে সনৎ-এর আর্থিক দায়ভারও নিজের কাঁধে তুলে নেয় নীতা। এরপরেই নীতার বাবা অসুস্থ ও কর্মক্ষম হয়ে পড়লে সমস্ত বাড়ির সম্পূর্ন আর্থিক দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয় নীতা। যে নীতা সবসময় উচ্চশিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন

দেখত, সেই নীতাকেই বি.এ ক্লাসের পড়া অসম্পূর্ণ রেখে বেড়িয়ে পড়তে হয় কাজের সন্ধানে। শেষমেশ একটা চাকরিও কোনমতে জুটিয়ে ফেলে সে। ধীরে ধীরে নিজের সমস্ত শখ আহ্লাদ ভুলে বাড়ির লোকেদের জন্য নিজেকে সঁপে দেয় নীতা। এমনকি যে সনৎ-এর সাথে কোনো একসময় সে সংসার করার স্বপ্ন দেখত সেই সনৎ নিজে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেও নীতা তাকে ফিরিয়ে দেয়। অবশেষে, সনৎ গোপনে নীতারই ছোট বোন গীতার প্রেমে পড়ে। নিজেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে গীতাকে সনতের দিকে এগিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি নীতার মা-ও। শেষপর্যন্ত, গীতার উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্নে ভেসে গিয়ে নিজের রিসার্চের স্বপ্ন ভুলে চাকরিতে যোগদান করে গীতাকে বিয়ে করে সনৎ। পাশাপাশি, বড় সঙ্গীত শিল্পী হওয়ার বাসনায় বাড়ির দায়িত্ব ভুলে বোম্বে পাড়ি দেয় নীতার দাদা শঙ্করও। সম্পূর্ন নিজের কথা ভেবে এক কারখানায় শ্রমিকের চাকরি নিয়ে অন্যত্র বাড়ি ভাড়া নেয় নীতার ছোটো ভাইও। কিন্তু বাড়িতে অসুস্থ বাবা ও মায়ের দায়িত্ব নিয়ে একা পড়ে থেকে যায় নীতা। অবশেষে, যখন একের পর এক পরিবারের সমস্ত ছোট সদস্যরা বাইরে একটি উন্নত জীবনের জন্য ঘর ছেড়ে চলে যায়, তখন নীতা একাই লড়াই করতে থাকে এক অজানা অসুস্থতার বিরুদ্ধে। এরপরেই নীতার ছোট ভাইয়ের অ্যাকসিডেন্ট হলে নিজের অসুস্থতা ভুলে ভাইকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় সে। ভাই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে নীতা। ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে সে। এরপরে আমরা দেখি, সফল সঙ্গীতশিল্পী রূপে কলোনিতে ফিরে আসে শঙ্কর। বাকিদের চোখে নিজের অসুস্থতা এড়িয়ে গেলেও, নিজের প্রিয় দাদার চোখ থেকে পালাতে পারেনা নীতা। শঙ্করের কাছে ধরা পড়ে যায় যক্ষ্মা আক্রান্ত নীতা। আজীবন বাড়ির প্রত্যেকের কথা ভেবে আসা বোনকে সুস্থ করার উদ্যোগ নিতে দেখা যায় একমাত্র শঙ্করকে। শিলং পাহাড়ে এক যক্ষ্মা নিরাময় কেন্দ্রে মৃতপ্রায় নীতাকে ভর্তি করে দিয়ে আসে শঙ্কর। শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি, প্রিয় দাদাকে জড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকার জন্য আর্তনাদ করে ওঠে। নীতা।

এরপর ১৯৬০-এ মুক্তি পায় ‘মেঘে ঢাকা তারা’। “বাংলার এক গরিব মেয়ে নীতার একা লড়াইয়ের গল্প। জানালা দিয়ে আলো, জলে প্রতিফলিত হয়ে নীতার মুখে পড়ছে, অসম্ভব সুন্দর একটি আবহ সঙ্গীত। সে দৃশ্য ভুলবার নয়। দুর্গারূপী নীতা পরিবারের সকলের বোঝা কাঁধে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে সকলকে এবং নিজেই হয়ে যায় পরিবারের বোঝা। প্রতারণা করে প্রেমিক সনৎ। অবশেষে নীতা চেঁচিয়ে বলে, “ দাদা আমি বাঁচতে চাই, দাদা আমি যে বাঁচতে বড় ভালবাসি। দাদা আমি বাঁচবো।” নীতার চরিত্রে সুপ্রিয়া দেবীর অসাধারণ অভিনয় সর্বোপরি ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় এই ছবি বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমার একটি মাইলস্টোন। এই ছবিতেই সনতের

মুখে ঋত্বিক ঘটক বলেছেন, " আদর্শ বলে একটা বস্তু হয়, যার জন্য মানুষকে সাফার করতে হয়।" (MAHAPATRA, 2020) তাঁর মতই আরেক ছিন্নমূল সুপ্রিয়া দেবীকে 'নীতা'র চরিত্রের জন্য বেছে নিয়েছিলেন ঋত্বিক।

'মেঘে ঢাকা তারা' ওপার বাংলা থেকে আগত একটি শরণার্থী পরিবারের মেয়ে নীতার গল্প বলে যে নিজেদের মধ্যবিত্ত মর্যাদা ধরে রাখার জন্য সংগ্রাম করে বাড়ির একমাত্র উপার্জনকারীর ভূমিকা নেয়। চলচ্চিত্রের শুরুতে মনে হয়, নীতা হয়তো একটি অপেক্ষাকৃত সুখী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সময় যত অগ্রসর হয় আমরা বুঝতে পারি, নীতা স্নেহপরবসত তার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন অন্যায় দাবির প্রতি সাড়া দেয়। এমনকি, নীতা তার আকর্ষণীয় এবং উচ্চাকাঙ্খী বোনের কাছে তার ভালবাসার মানুষটিকেও বিনা দাবিতে হারিয়ে ফেলে। একটা ফুল টাইম চাকরির জন্য তার পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং শেষপর্যন্ত অবিশ্বাস্য ও দুঃখজনকভাবে একটি স্যানিটোরিয়ামে টিবিতে মারা যায়। অন্যদিকে, নীতার পরিবারের প্রতিটি সদস্য, এমনকি তার প্রিয়তম দাদাও তাদের সেই মুহূর্তের আর্থিকভাবে নিরাপদ পারিবারিক জীবনে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। যার জেরে তাদের প্রত্যেকের মনে নীতা নিছকই এক স্মৃতি হিসেবে রয়ে যায়। ঋত্বিক বহু ফিল্মেই আমরা পাই Archetype Mother-এর রেফারেন্স। যেমন নীতার মাধ্যমে বারবার দেবী 'উমা'- কে দেখাতে চাইতেন ঋত্বিক ঘটক। 'মেঘে ঢাকা তারা'র বহু ফ্রেমেই উমার রেফারেন্সের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রয়েছে বহু প্রাচীন 'গৌরীদান'-এর রূপক দৃশ্যও। নীতার বাবার মুখেই আমরা জানতে পারি, তাঁর প্রিয় 'খুকি'র জন্ম 'জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনে। সমস্ত পরিবারের দায়িত্ব দেবী অন্নপূর্ণার মতই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে নীতা। যখন সিনেমায় নীতার প্রথম যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ দেখা যায়, তখনই যেন উমার বিসর্জনের সুর বেজে ওঠে। আবহ সঙ্গীত রূপে বাজতে থাকে মা মেনকা-র বিলাপী পালা সঙ্গীত। আবার আমরা সিনেমার শেষ দৃশ্যে দেখি নীতা তার প্রিয় পাহাড়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। এখানে পাহাড় 'মহাকাল'-এর রূপের প্রতিভূ।

নীতার নিঃস্বার্থভাবে নিজের পড়াশোনা, নিজের সুখ, সংসারের স্বপ্ন, প্রেমিক সবকিছু বারবার পরিবারের স্বার্থে বিসর্জন দেয়। ওর পরিবার নিজেদের স্বার্থের জন্য নীতাকে ব্যাবহার করতে পিছপা হয়নি একবারও। আর এখানেই নীতা হয়ে ওঠে গৌরিদানের প্রতিক। বাড়ির উঠোন যা হিন্দু ধর্ম মতে যজ্ঞের স্থান, সেই যায়গায় দাড়িয়েই নীতার স্বার্থপর লালায়িত মা ও ভাইবোনরা মিলে ওর সর্বনাশের মন্ত্রনা করতে থাকে। ওকে ঠেলে দিতে থাকে অন্ধকারের অন্তরালে। আর এই দৃশ্যগুলোতে ফুটন্ত জলের শব্দের ও ধোঁয়ার ব্যবহার লক্ষণীয় কারণ এরই মাধ্যমে নীতার জগদ্ধাত্রী রূপকে

প্রতিষ্ঠা করেন পরিচালক। পুরাণ মতে, যজ্ঞের ধোঁয়া থেকেই দেবী জগদ্ধাত্রীর জন্ম। আর এখানে সেই ধোঁয়াকেই ব্যবহার করা হয়, নীতার সর্বনাশের প্রতীক হিসাবে।

ছবির শেষে নীতা যখন টিবি রোগে সংক্রমিত হয় তখন বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমনের তোড়জোড় চলছে। সেই মুহূর্তে অন্যদের কথা ভেবে শেষপর্যন্ত এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে ওর শিক্ষক বাবাও নীতাকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলে। আমরা ওই জল-কাদার মধ্যেই নীতাকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখি। এ যেন উমার পিতৃগৃহে একপাক্ষিক কাল অবস্থানের পর জলে বিসর্জনেরই আরেক দৃশ্য। এই সময় অত্যন্ত সচেতনতার সাথে আবহসঙ্গীত রূপে “ আয় গো উমা কোলে লই” এই লোকগীতি ব্যবহার করা হয়েছে। পুরানের সাথে বারবার বাংলা সংস্কৃতির খুব সুন্দর মেলবন্ধন ঘটেছে এই ছবিতে। শেষমেশ পাহাড়েই বিলীন হয়ে যায় সীতা।

ঋত্বিকের নারী চরিত্ররা দুর্বল নয়। এরা অজস্র দুঃখ, বাধা বিপত্তির মধ্যেও প্রতেকেই নিজের জীবন নিজের মতন করে, নিজের সিদ্ধান্তে বাঁচতে জানে আর তার জন্য তৈরি হওয়া টানাপোড়েনের জন্য অন্য কাউকে দায়ী করেনা। ‘মেঘে ঢাকা তারা’-র শেষে নীতা দাদার কাছে স্বীকার করে দোষটা ওরই ছিল, যে ও নিজের কথা ভাবিনি। নাহলে সে-ও সবকিছু ফেলে গীতার মত সুখী হতে পারত। যে বাচ্চাটিকে নিয়ে সারা বাড়ি এমনকি শঙ্কর পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত, সে হতে পারত নীতার সন্তান। কিন্তু নীতা স্ব-ইচ্ছায় বাড়ির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে, বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এর জন্য নীতার কোনো আফসোস নেয়। সে আরোও বাঁচতে চায়, জীবনকে নিজের শর্তে উপভোগ করতে চায়।

‘সুবর্ণরেখা’ ছবিটির মাধ্যমে ফের আরেকবার দেশভাগের গল্প বলেছেন ঋত্বিক ঘটক। ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদেশে চলে আসে উদ্বাস্তু হিন্দু শরণার্থী ঈশ্বর চক্রবর্তী। ঈশ্বর তার ছোট বোন সীতার সাথে সদ্য সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গে এসে ফের আরেকবার নতুন জীবন শুরুর চেষ্টা করেন। এরপরেই পরিচালক ঋত্বিক ঘটক দেখিয়েছেন সে সময় গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনির দৃশ্য। ওই উদ্বাস্তু কলোনিতে আশ্রয় খুঁজতে আসা একটি নিম্নবর্ণের মহিলাকে অপহৃত হতে দেখে ঈশ্বর ওই মহিলার ছোট ছেলে অভিরামের দায়ভার গ্রহণ করেন। এরপরেই তার কলেজের পুরনো বন্ধু রামবিলাসের সৌজন্যে ঈশ্বর সুবর্ণরেখা নদীর কাছে ছাতিমপুর প্রদেশে একটি কারখানায় চাকরি পান। এরপরেই চাকরিতে যোগ দেবার জন্যে সীতা এবং অভিরাম সহ ঘাটশিলার কাছে একটি ছোট বসতি ছাতিমপুরে পৌঁছান ঈশ্বর। সেখানেই তাদের আলাপ

হয় ফাউন্ড্রি ওয়ার্কশপের ফোরম্যান মুখার্জির সাথে। অভিরামকে কিছুদিন পরেই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ঝাড়গ্রামে পাঠিয়ে দেন ঈশ্বর। যার জেরে নিজের আবাল্য খেলার সঙ্গীকে হারিয়ে ফের একলা হয়ে যায় সীতা। অভিরাম অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তার অধ্যয়ন শেষ করে যেদিন তিনি গ্রামে ফিরে আসে সেদিনই ঈশ্বরকেও ওই কারখানার নতুন ম্যানেজার হিসেবে হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এরপরেই অভিরাম জানতে পারেন ঈশ্বর তার অগোচরে ইতিমধ্যেই একটি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার আবেদন করেছেন। কিন্তু অভিরাম শেষপর্যন্ত ঈশ্বরের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। আসলে অনেক আগে থেকেই অভিরাম মনে মনে লেখক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। এরপরেই আমরা দেখি, সীতা এবং অভিরামের দুজনেই একে অপরের প্রতি নিজেদের ভালোবাসার উপলব্ধি করে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ঈশ্বরের মনে দেখা দেয় সেই চিরাচরিত কুসংস্কারের ভয়। সে চায় না তার উচ্চব্রাহ্মণ বংশীয় বোন একজন নিম্নবর্ণের পিতৃ-মাতৃহীন ছেলেকে বিয়ে করুক। আর ঠিক এই সময়েই, অভিরামেরও জাত অন্যদের কাছেও প্রকাশ পেয়ে যায় যখন সে তার হারিয়ে যাওয়া মৃত মাকে রেলস্টেশনে অনেক লোকের সামনে চিনতে পারে। এমতাবস্থায়, ঈশ্বর নিজের আসন্ন বিপদ অনুধাবন করেন এবং অভিরাম সীতাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তাকে সত্তর কলকাতা চলে যেতে বলেন। এরপরেই ঈশ্বর সীতাকে পাত্রস্থ করার অভিপ্রায়ে অস্থির হয়ে ওঠেন। কিন্তু বিয়ের দিন শেষপর্যন্ত সবার অলক্ষ্যে সীতা এবং অভিরাম কলকাতায় পালিয়ে যায়। সীতার এহেন আচরণে ঈশ্বর অত্যন্ত দুঃখিত হয়।

সীতা এবং অভিরাম বাড়ি থেকে পালিয়ে সংসার করার বাসনায় কলকাতার বস্তিতে এসে ওঠে এবং অতীব দরিদ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করেও প্রতিদিন অন্তত একসাথে সুখী থাকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। তাদের সংসারে এখন একটি ছোট ছেলেও আছে। শেষমেশ, একটা সরকারি বাস ড্রাইভারের চাকরি জুটিয়ে ফেলে অভিরাম। কিন্তু এই সুসংবাদই ট্র্যাজেডির দিকে মোড় নেয় যখন অভিরাম দুর্ঘটনাক্রমে একটি ছোট মেয়েকে বাসে পিষে দেয় এবং এরপরেই উত্তেজিত জনতা অভিরামকে প্রচণ্ড মারধর করায় অভিরামের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। এই হতাশাজনক পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত সীতা পতিতাবৃত্তি গ্রহণের কথা ভাবতে বাধ্য হয়।

এরই মধ্যে সীতা ও অভিরামকে হারিয়ে ছাতিমপুরে সম্পূর্ন নিঃসঙ্গ ও বিষাদময় জীবনযাপন করছিলেন ঈশ্বর। এই সময় তার পুরানো বন্ধু হরপ্রসাদ তার সাথে দেখা করতে আসে এবং দুজনে মিলে কলকাতায় মদ্যপানের সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ পর্যন্ত দুজনেই সম্পূর্ণ

মাতাল অবস্থায় একটি পতিতালয়ে গিয়ে ওঠেন। এরপরেই ওই পতিতালয়ে ঈশ্বর মুখোমুখি হন তার নিজের বোন সীতার সাথে। ঘটনাক্রমে, নিজের অজান্তে পতিতালয়ে নিজের বোনেরই প্রথম “ক্লায়েন্ট” হয়ে পরে ঈশ্বর। সীতাও তাৎক্ষণিকভাবে নিজের দাদাকে চিনতে পারে। এই লজ্জায়, দুঃখে নিজের গলা কেটে আত্মহননের পথ বেছে নেয় সীতা। সীতাকে মৃত অবস্থায় দেখে অত্যন্ত ভেঙে পড়েন ঈশ্বর।

সীতার এই পরিণতির জন্যে নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করে ঈশ্বর এবং সীতার আত্মহত্যার দায়ও নিজের উপর নিয়ে নেয়। যদিও দু'বছর আইনি টানাপোড়েনের পর বেকসুর মুক্তি পায় ঈশ্বর। চলচ্চিত্রের প্রায় শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই, সম্পূর্ণ ভগ্ন ঈশ্বর সীতার ছেলে বিনুর সাথে দেখা করে, যে এখন তার সবচেয়ে কাছের ও একমাত্র আত্মীয়। ঈশ্বর ও বিনু ঘাটশিলা রেলস্টেশনে এসে পৌঁছায়। ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে, ঈশ্বর ফোরম্যান মুখার্জির কাছ থেকে একটি চিঠি পান যেখান থেকে তিনি জানতে পারেন যে তার সততা এবং তার বোন আত্মহত্যা করার পরে তিনি যে আইনি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন তার জেরে তাকে তার পরিচালকের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং মুখার্জিকে এখন নতুন ম্যানেজার পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এরপরেই মুখার্জি ঈশ্বরকে কোয়ার্টার খালি করতে বলেন। ঈশ্বর এই ঘটনার জেরে প্রথমে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু তিনি ছোট বিনুকে দেখতে পেয়ে শান্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন ওই ছোট ছেলেটির দায়ভার নেওয়ার। ফিল্মটি শেষ হয় সুবর্ণরেখার তীরে দুজনের কোয়ার্টারে এসে বিনুর সাথে, বাস্তবতা না জেনে তার নতুন বাড়ি দেখার আনন্দে মশগুল বিনু। এই নতুন বাড়ির স্বপ্ন সে চিরকাল দেখেছে তার বাবা মায়ের সাথে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে ঈশ্বর এখন কর্পদক শূন্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার ভাগ্নের এই নির্মল স্বপ্ন ভগ্ন না করার অভিপ্রায়ে সত্য গোপন করার যান।

অনন্য গল্প, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল এবং সর্বোপরি চরিত্রগুলির পাশাপাশি সুবর্ণরেখার নৈপুণ্য হল সিনেমার নায়ক সীতা। সীতা যেন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং বাস্তুচ্যুত জীবনযুদ্ধের ময়দানে ঘটকের আবেগের প্রতীক। যার জেরে সীতার চরিত্রটি আজও ডায়াস্পোরিক সিনেমার জগতে অমর হয়ে আছে। এই চরিত্রটি যেন ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর এদেশের টালমাটাল সমাজের লিঙ্গ এবং বর্ণ-ব্যবস্থার পাশাপাশি উদ্বাস্তু রাজনীতির একটি চিত্র যা পরবর্তীকালে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে লিঙ্গ ও জাতিভেদে যে ট্যাবুর পথ প্রশস্ত করে যা আজও বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

উদ্বাস্তু হিসাবে তার বাস্তুচ্যুত পরিচয়টি ক্রমাগত তাকে তার লিঙ্গ এবং সমাজের চোখে তার কি করনীয় সেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। কিন্তু সীতা বারবার চেষ্টা করে যায় নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে এই সমস্ত পরিচয়কে ঢেকে ফেলে একান্তই নিজের পরিচয় তৈরি করতে। তাই আমরা দেখি, সীতার চরিত্রটি বারবার তার নিজের পরিচয়কে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। যেমন, জাতপাত ভিত্তিক কলঙ্কের ভয়ে এবং সর্বোপরি নিজের কুসংস্কার ও পদোন্নতির আশায় ঈশ্বর সীতাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সীতাকে এমন একটি সামাজিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যা তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী উপযুক্ত ছিল। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে দাঁড়িয়ে যেখানে নারী স্বাধীনতা অত্যন্ত হাস্যকর বিষয়বস্তু বলেই গণ্য হয়েছে সেসময় দাঁড়িয়েও সীতা নিজের পছন্দ-অপছন্দের চাহিদা নিয়ে অবিচল থেকেছে। সীতা এবং অভিরামের একসাথে সংসার করার ইচ্ছের জোরে কলকাতা পালিয়ে যাওয়া ‘সুবর্ণরেখা’র শক্তিশালী দৃশ্যগুলির মধ্যে একটি। সদ্য ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ভারতে যখন জাত-পাত, ধর্মের টানাপোড়েন অব্যাহত সে সময় সীতা ও অভিরাম জাতিগত দ্বন্দ্বকে তোয়াক্কা না করে যে সাহস দেখিয়ে একে অপরকে বিয়ে করেছিলেন তা সত্যিই কুর্নিশ যোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আন্তঃবর্ণ বিবাহ এবং সম্পর্ক আজও ভারতবর্ষের মত গণতান্ত্রিক দেশে স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল বিষয়। এখনও প্রায় প্রতিদিন অন্য ধর্ম বা জাতে বিবাহ বা সম্পর্কের জেরে অনার কিলিং-এর মত ঘটনা চোখে পরে। সেখানে সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত টালমাটাল দেশে সীতার এই বিদ্রোহ যেন সমাজের এই বিষাক্ত ব্যাধিকে বারবার চ্যালেঞ্জ জানায়।

নিজের সিদ্ধান্তের মালিক হওয়া সত্ত্বেও, সীতা কি আদৌ কোনোদিন আক্ষরিক অর্থেই নিজের ইচ্ছের বা সিদ্ধান্তের মালিক হতে পেরেছে? দেশ ছেড়ে আসার পর থেকেই তার দাদা অর্থাৎ ঈশ্বর তার অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে এসেছে। মাঝে মাঝেই সেই অভিভাবকত্বকে ছাপিয়ে গিয়েছে অনুশাসন। ঈশ্বরের ইচ্ছেই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য অভিরামকে ঝাড়গ্রাম পাঠানো হলেও সীতার শিক্ষাব্যবস্থা আটকে থাকে ছাতিমপুরের গণ্ডির মধ্যেই। দাদার ইচ্ছানুসারে সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ করে সীতা। কিন্তু সেই গানকেই ভালোবেসে নিজের জীবনের সাথে একাত্ম করে নিয়েছিল সীতা। পরবর্তীকালে আমরা দেখি, প্রেম-যা একান্তই নিজস্ব সিদ্ধান্ত সেখানেও বোনের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানোর বদলে সেই ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে পিছপা হননি ঈশ্বর। এরপরে আবার আমরা সীতাকে দেখি সীতার নতুন পরিচয় অভিরামের স্ত্রী হিসাবে। স্বামী অভিরাম এবং সন্তান বিনুর প্রতি অতিরিক্ত যত্নের পাশাপাশি গৃহস্থালির কাজকর্মের জেরে এখানেও সীতার পরিচয় সেই একই থেকে যায়। সে ছাতিমপুরে

দাদার সংসার সামলাত, এখন কলকাতায় এসে স্বামীর সংসারের জন্য প্রাণপাত করে। ওই ভাঙাচোরা ঘরেই বিভিন্ন সময়ে বারবার সীতাকে গান গাইতে দেখা যায়। আসলে গানের মাধ্যমেই একান্ত নিজের এক পরিচয় গড়ে তোলার সুপ্ত বাসনা সীতার মনের গভীরে প্রোথিত ছিল বহুকাল ধরেই। কিন্তু বিয়ের পর সংসারে ধর্মে প্রবেশের সাথে সাথেই তার পরবর্তী জীবনের পরিচয় নির্দিষ্ট করে দেয় সমাজের কিছু অলিখিত চুক্তি।

'সুবর্ণরেখা'র বিভিন্ন ফ্রেম আচ্ছন্ন থাকে ব্রিটিশ পরবর্তীকালেও বাংলায় বিদ্যমান বর্ণপ্রথার অতি-দৃশ্যমানতা। দেশভাগের পর যখন কলকাতা ও নিকটস্থ শহরতলী জুড়ে যখন উদ্বাস্তু কলোনি স্থাপন করা হচ্ছিল, ঠিক তখনই 'সুবর্ণরেখা'র প্রথম দৃশ্যেই জমির মালিকদের ফ্যাসিবাদী নির্দেশে নিম্নবর্ণ মানুষদের বসতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ধরপাকড়ের দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। মুভির চরিত্রগুলি বারবার জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথাকে একটি পূর্বপুরুষের দায়িত্ব পালনের ন্যায়সঙ্গত করে তোলার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছে বারবার। "আমরা যদি আমাদের বর্ণের গুণের যত্ন না করি এবং পরিবর্তে তাদের (নিম্ন বর্ণের) সাথে মিশ্রিত করি তবে আমাদের আর কী থাকবে?" সিনেমার শুরুতেই এরকম একটি প্রশ্ন ঈশ্বরের বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতে দেখা যায়। অভিরাম এবং সীতার বিয়ে করা কোনোদিনই সহজ ছিল না, কিন্তু বিবাহ পরবর্তী পরিণতি ছিল আরও কঠিন। তাদের আন্তঃজাতিগত সম্পর্ক ও দারিদ্রতার কারণে, তাদের ছেলে, ছোট বিনুর সাথে কলকাতার বস্তিতে থাকতে বাধ্য হয়েছিল সীতা ও অভিরাম। একসময় লেখক হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করা অভিরাম শেষপর্যন্ত বাধ্য হয় বাসের ড্রাইভারি করতে। যা পরবর্তীকালে তাদের জীবনে বিপর্যয় হয়ে নেমে আসে।

একটি দৃশ্যে সীতা উল্লেখ করে যে আরও একটু আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্যে সে অন্যদের জন্য গান করতে চায়। কিন্তু এই কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে এই দাবি অভিরাম নির্মমভাবে বাতিল করে দেয়। ফের একবার প্রমাণিত হয় যে কীভাবে সীতার সিদ্ধান্তগুলিকে অভিরাম নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল। একই সাথে এই দৃশ্য সেই বিস্মৃতির কথাও প্রকাশ করে যে সীতা, বাংলার একটি উচ্চবর্ণের পরিবার থেকে এসেছে। দেশভাগের পূর্বে অথবা পরে নারীদের গান গাওয়া বা নৃত্য প্রদর্শনী বেশ্যাবৃত্তির সাথেই সমতুল্য ছিল। বাংলায় গড়ে ওঠা ওপার বাংলা থেকে আসা নিম্ন বর্ণের মহিলারাই সেসময় এধরনের কাজের সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু সম্পূর্ন সম্ভ্রান্ত, উচ্ছবর্ণ থেকে আসা সীতার এই কথা সম্পূর্ণরূপে অজানা ছিল। কিন্তু সীতার মাধ্যমে যে ঋত্বিক ঘটক আসলে সেসময় এপার বাংলার সামাজিক - অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন তা যেন

ফের একবার প্রমাণিত হয়। কিন্তু অভিরামের মৃত্যুর পর, সীতা শেষপর্যন্ত পতিতালয়েই গান গাইতে শুরু করে এবং ফের তার পরিচয় পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এইবার এমন একটি কাজের জন্যে যা পূর্বে সে স্বেচ্ছায় প্রস্তাব করে কিন্তু প্রত্যাখ্যাত করা হয়েছিল। এই ঘটনা সেই যুগের পরস্পরবিরোধী রং প্রকাশ করে।

‘সুবর্ণরেখা’র সিনেমাটির সবথেকে বড় পরিহাস হল যে সম্পূর্ন সিনেমা জুড়ে পুরুষ কন্ঠের আধিক্য সত্ত্বেও, সিনেমার নায়ক সীতা একজন মহিলা। সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যটি যেন একটি সুস্পষ্ট ব্যঙ্গ, যেখানে সীতার মাধ্যমে শুধুমাত্র লিঙ্গ পরিচয় বা রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করা হয় না, বরং সমাজের ভিত্তিমূলে নিহিত পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও উপহাস করেছেন ঋত্বিক ঘটক। এছাড়াও সীতা নিজে একজন মহিলা হিসাবে সেসময়কার আর্থ-সামাজিক, লিঙ্গ পক্ষপাতিত্বের মধ্যে মোহিত হয়েও] তা সত্ত্বেও বহুবার এটি ভাঙার চেষ্টা করে। সে তার দাদার সাথে অগ্নিগর্ভ কথোপকথন হোক বা নিজের ব্যাক্তিগত পছন্দ সম্পর্কে অবগত হওয়া, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হোক বা মাঠে ঘাটে খেয়ালখুশি মত গান গাওয়া হোক, সীতা বারবার নিজের জন্য পথ তৈরি করার সমস্ত সুযোগ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে।

সীতার এই অগুনতি পরিচয়ের মধ্যেও সীতার সবথেকে প্রিয়তম পরিচয় বোধহয় ‘বিনুর মা’। দিগন্তবিস্তৃত জমি, খাল ও নদীমাতৃক ওপার বাংলায় নিজের জন্মভিটে ছেরে ছোট্ট সীতা নিজের ‘নতুন বাড়ি’ খুঁজে পায় রুক্ষ, পাথুরে ঝাড়খণ্ডের ছাতিমপুরে। কিন্তু ছোট্ট সীতার মনে গেঁথে থাকে তার ছোটবেলার গ্রামের দৃশ্য। তাই অভিরামের সাথে খেলতে খেলতে কিংবা একান্তেই সে বারবার গেয়ে ওঠে “আজি ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়....”। এই একই গান সে গেয়ে শোনায় ছোট্ট বিনুকেও। ছোট্ট বিনুর কল্পনাতেও সে এঁকে দেয় তার ফেলে আসা গ্রামের পথ-ঘাট, ধান ক্ষেতের ছবি। দেশ হারানো সীতার মতই ওই ভাঙাচোরা বাড়ির বদলে নতুন বাড়ির স্বপ্ন দেখে বিনু। ছেলের সেই স্বপ্নের প্রস্রয়দাতা তার সীতা মা। ছবির শেষ দৃশ্যে এসেও আমরা দেখি, ছাতিমপুরে ফিরে এসে বিনুর মধ্যেই যেন সীতাকে খুঁজতে থাকে ঈশ্বর।

ঋত্বিক ঘটকের এই দুটি সিনেমা বারবার দেশভাগের যন্ত্রণা ও তার পরবর্তী জীবনযুদ্ধের আখ্যান তুলে ধরে। দুটি সিনেমাতেই কেন্দ্রীয় চরিত্র নারী। দুজনেই জীবনের সমস্ত উত্থান পতন পেরিয়ে যেন জীবনযুদ্ধে হেরে যায় স্বাধীনতা প্রাপ্য দেশের মতোই। ঋত্বিক কখনোই দেশভাগের যন্ত্রণা ভুলে বাঁচতে পারেননি। তিনি শুধুমাত্র এই দর্শনের সাথে বসবাস করছিলেন

এমনই নয় বরং এটি তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নত করেছিল যে ধারণার উপর ভিত্তি করেই তিনি তার অধিকাংশ সিনেমার থিম হিসেবে শিকড় উপড়ে আসা ছিন্নমূল মানুষদের বেছে নিয়েছিলেন। শহুরে অস্তিত্বের সৌন্দর্য সম্পর্কে তার উদাসীনতা ও রহস্যময় নীরবতা তাকে পুরোপুরি শহুরে জীবনের অস্বস্তিকরতা এবং ভয়ঙ্করতার দিকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য করেছিল। তার চলচ্চিত্রে প্রকৃতির ব্যবহার এবং তার স্মৃতির পট থেকে উঠে আসা আঁকা দৃশ্য সবই নস্টালজিয়ায় পরিণত হওয়ায় তার চলচ্চিত্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক-স্বাধীনতার দিনগুলি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেল পয়েন্ট। ঋত্বিক জানতেন যে, পৌরাণিক কাহিনীগুলি শুধুমাত্র মানুষের মনের সম্মিলিত অচেতনতাই শুধু নয়, এই কাহিনীগুলোর রেফারেন্স বারবার নস্টালজিক অস্তিত্বের সাথে পুনরাবৃত্ত হবে তার সিনেমার সাথে। এধরনের রেফারেন্সের উপস্থিতি অবিলম্বে তাকে স্বাধীনতার পরবর্তি ভারতের গ্রামীণ জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী চলচ্চিত্র নির্মাতাতে পরিণত করে। "সুবর্ণরেখা"- তে, ঈশ্বর যখন তার ভাগ্নের সাথে বাড়ি ফিরে আসে, তখন শিশুটি সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে ধানক্ষেতে ছুটে যায়। পাকা ধান গাছে ভরা দৃশ্য, সীতার মৃত্যু পরবর্তী ক্লাস্ট্রোফোবিক পরিস্থিতির অত্যাচার থেকে আমাদের মুক্তি দেয় এবং অভিবাসন ও স্থানচ্যুতি-র ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তনের মত বৃহত্তর সত্যের সামনে দাঁড়াতে বাধ্য করে। ঘটকের সমস্ত চলচ্চিত্রের চরিত্ররা বারবার ছুটে যায় তাদের শিকড় খোঁজার উদ্দেশ্যে। আর্কিটাইপগুলির জন্য তার আবেগপূর্ণ অনুসন্ধানে, তিনি হারিয়ে যাওয়া পূর্ববর্তী বাংলার একজন উপাসক হয়ে ওঠেন এবং বিভাজনের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে শক্তিশালী কণ্ঠে পরিণত হন এবং স্থানচ্যুত, ছিন্নমূল ও বিভাজনের গল্পকে বিভিন্ন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এপিসোডিক উপস্থাপনা সহ একটি দীর্ঘ টানা সিনেমাটিক আখ্যানে রূপান্তরিত করেন।

ঘটক একটি অনন্য শৈলী গড়ে তুলেছিলেন যা তার চলচ্চিত্রে বাস্তববাদ, পুরাণ এবং মেলোড্রামাকে একত্রিত ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করত। নীতা, সীতা এবং অনসূয়া, ঘটকের দেশভাগের ট্রিলজি 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা' ও 'কোমল গান্ধার'-এর তিন নায়িকা আদপে রক্তমাংসের নারী হলেও পরিচালক ঋত্বিক ঘটক তাদের সমসাময়িক কষ্টের কাহিনীগুলিকে পৌরাণিক মাত্রা দিয়ে একটি নিরন্তর আবেদন দিয়েছেন। তাদের নিজস্ব অনন্য জীবনযাত্রার জেরে তিন নায়িকায় যেন যথাক্রমে দুর্গা, সীতা এবং শকুন্তলার যন্ত্রণার প্রতিনিধিত্ব করে।

দেশভাগের পর বাস্তুহারাদের জীবনযাত্রার সবচেয়ে শক্তিশালী শৈল্পিক নিদর্শন ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্য তুলে ধরাই

ছিল তাঁর সিনেমার মূল উদ্দেশ্য। দেশভাগকে কোনওদিন মেনে নিতে না পারায় ঋত্বিক ঘটকের কাছে দেশভাগ অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলার দর্শকমহলের কাছে স্বীকৃতি তিনি নিজের জীবদ্দশায় কোনোদিনই পাননি। বাংলা চলচ্চিত্র জনগণের দ্বারা তিনি ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে অন্যতম উদ্ভাবনী ঋত্বিক ঘটকের ক্ষেত্রে এই উপেক্ষা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ছিল। ঋত্বিক ঘটক সর্বদাই "শরণার্থী" শব্দটির বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি তাঁর ছবির মাধ্যমে বারবার বাংলার উদ্বাস্তুদের গৃহহীনতার কারণে উদ্‌ভূত নিরাপত্তাহীনতা ও উদ্বেগ তুলে ধরেছেন; বাঙালী সংস্কৃতির শিকড়ে দেশভাগ কীভাবে আঘাত করেছিল তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বারবার তাঁর ছবিতে দেশভাগ পূর্ববর্তী নস্টালজিয়া তুলে ধরেছেন যা দেশভাগের দরুন ওপার বাংলা থেকে আগত মানুষদের বারংবার তাদের পূর্ববর্তী জীবনের কথা মনে করিয়েছে। দেশভাগের থিমের সঙ্গে ঘটকের মতো গভীর সম্পৃক্ততা আর কোনো বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে চার

দশকের মধ্যে, চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু রূপে 'দেশভাগ'- তৎকালীন পরিচালকদের কল্পনা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত বলেই মনে হয়।

রেফারেন্স

ABIR MUKHOPADHYAY. (2016). ঋত্বিক! একটি নদীর নাম (আনন্দবাজার https://www.anandabazar.com/patrika/a-special-write-up-on-ritwik-ghatak-1.408042)

ANKITA APURVA. (2021). Decoding Subarnarekha On Ritwik Ghatak's Death Anniversary. (Feminismin in India https://feminisminindia.com/2021/02/08/decoding-subarnarekha-on-ritwik-ghataks-death-anniversary/)

ARUN SANYAL. (2021). SHAMPRATIK DESHKAL.

MEGAN CARRIGY. (2003). Ghatak, Ritwik. SENSES OF CINEMA. (http://www.sensesofcinema.com/2003/great-directors/ghatak/)

SANKHA GHOSH. (2020). Birth Anniversary Special: Poetry of Partition and the films of Ritwik Ghatak. (TIMES OF INDIA - https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/bengali/movies/news/birth- anniversary-special-poetry-of-partition-and-the-films-of-ritwik-ghatak/articleshow/79019696.cms)

SUMAN MAHAPATRA (2020). সময়ের থেকে এগিয়ে ভেবেছিলেন, এটাই 'অপরাধ' 'মেঘে ঢাকা ঋত্বিকের' (ZEE NEWS - https://zeenews.india.com/bengali/entertainment/60-years-ago-meghe-dhaka-tara-released- by-ritwik-ghatak-on-this-day-14th-april_310192.html)

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়. (2005). সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়-এর, অন্যান্য ও ঋত্বিকতন্ত্র (পৃ. 93). Kolkata: চলচ্ছবি.